মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত সমাজ বিবর্তন

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

আগস্ট ২০১২

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত সমাজ বিবর্তন

[পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'ওয়েভ ফাউন্ডেশন'-এর আয়োজনে
২৪শে মার্চ ২০১২ তারিখে
দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও লোক-মোর্চা কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
প্রদত্ত লেখকের বক্তৃতার ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ তৈরি করা হয়েছে।]

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

আগস্ট ২০১২

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১২

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
টেলিফোনঃ ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২; ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইলঃ pksf@pksf-bd.org, ওয়েব সাইটঃ pksf-bd.org

মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত সমাজ বিবর্তন

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক, উপস্থিত সকল কর্মকর্তা, লোক-মোর্চার সকল সংগঠক ও অন্যান্য প্রতিনিধি, উপস্থিত বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দ, সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই ২২ বছরে সংস্থার অর্জন অনেক। যেকোনো সংগঠন শুরুতে ছোট থাকে, আস্তে আস্তে বড় হয় এবং অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত শিক্ষাকে ধারণ করে এগিয়ে যায়। এটা যাঁরা করতে পারেন না, তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন না। আমি আশা করছি যে, ওয়েভ ফাউন্ডেশন আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ হবে এবং এদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, আমরা সবাই পিকেএসএফ পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি।

আজকে ২৪শে মার্চ, দু'দিন পর ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এই দিবসের চেতনাকে সব সময় ধারণ করেই, আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন এবং তৎপরবর্তীকালে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদেরকে আজ আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি । এ সকল আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা সম্মান জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

দেশকে স্বাধীন এবং মানুষকে সকল বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। কিন্তু দেশবাসী আজও নানা বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়নি। অনেক মানুষ আজ নানাভাবে বঞ্চিত। মানুষকে যদি সেই বঞ্চনা থেকে উদ্ধার করতে হয় তাহলে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। উন্নয়নকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর রাজনীতি হতে হবে জনকেন্দ্রিক। রাজনীতিতে অবশ্যই মতভেদ থাকবে, তবে দেশের এবং দেশের মানুষের স্বার্থে মৌলিক জাতীয় বিষয়গুলোতে ঐকমত্য থাকা জরুরি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন সর্বজনগ্রাহ্য ও টেকসই করতে হলে কাউকে বাদ দেয়া যাবে না, অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে এবং সবাই মিলে কাজ করতে হবে। সবাইকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রথমেই সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে, শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং স্বাস্থ্যসচেতন করতে হবে। বঞ্চিত মানুষকে যদি বঞ্চনা থেকে উদ্ধার করতে হয়, তাহলে আমাদের সবাইকে পরস্পরের কাছে আসতে হবে এবং পারস্পরিক সমস্যাগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করে কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

*** কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, অর্থনীতিবিদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ**

যার যতটুকু সম্পদ আছে সেই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফলে সম্পদ বৃদ্ধি করাও সহজতর হবে। তাতে নিজের ও সমাজের সকলেরই কল্যাণ হবে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই সংস্কৃতির তেমন বিকাশ ঘটেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। একজন ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমা থেকে ওপরে উঠে গেলেন, তার মানে তিনি কি মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন? সেটা বিবেচনা করতে হলে, দেখতে হবে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পারিপার্শ্বিকতার কি অবস্থা, তার স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ কতটুকু সম্প্রসারিত হয়েছে, সমাজে তার চালচলন কেমন এবং সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু বেড়েছে। তাছাড়া মানব-মর্যাদার সাথে মানবাধিকারও ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সর্বজনীন মানবাধিকারও নিশ্চিত হওয়া জরুরি। অর্থাৎ খাদ্য, জীবন-জীবিকা, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং সকল বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়েই মানুষ সমাজে মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। সেই লক্ষ্যে, প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং শিক্ষণীয় একটি নাটিকা আমরা উপভোগ করলাম। এর মধ্যে ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-এর মধ্যবর্তী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী, আমাদের শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধের কথা আছে। আর আছে আমাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা, বৈষম্য, অধিকার ও বঞ্চনার কথা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সক্ষমতা এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার কথা। এতগুলো বিষয় ১৩ মিনিটের নাটিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা খুব কঠিন। নাটিকাটি যাঁরা করেছেন, তাঁরা যদি অত্যন্ত দক্ষ না হতেন, তাঁরা যদি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট না হতেন এবং যথাযথ অনুশীলন না করতেন, তাহলে এটি সম্ভব হতো না। এই পরিবেশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

আপনারা অনেকেই বলেছেন, বাংলাদেশের অর্জন অনেক, যা আসলেই সত্য। আমরা যখন স্বাধীন হয়েছিলাম, তখন আমাদের রাস্তাঘাট, ঔষধ, খাদ্য, হাসপাতাল কিছুই ছিলো না, সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। আজকে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। শস্যজাত খাদ্যে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে। দেশের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ জনগণ শিক্ষিত। যদিও শিক্ষার মান নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে, শিক্ষিত বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় সেটা নিয়েও সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও বলা যায় আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি– আমি যখন ১৯৫৮-৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন আমাদের তিনজন সহপাঠিনী ছিলেন, আর আমরা ছাত্র ছিলাম ৬০-৬৫ জন। আমাদের সহপাঠিনীগণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করার সময় শিক্ষকদের সাথে তাঁরা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতেন, আবার শিক্ষকদের সাথে বেরিয়ে যেতেন। সেই অবস্থা থেকে বর্তমানে ব্যাপক উত্তরণ ঘটেছে। বর্তমানে সম্মানজনকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা একসঙ্গে উঠা-বসা করে, ক্লাসে যায়, পড়াশুনা করে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে অনুপাত প্রায় সমান, বরং মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় কিছু বেশি। তবে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অনুপাত মাত্র ৩৯ শতাংশ। এক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। সামাজিক কাঠামো ও ব্যবস্থার কারণে অনেক মেয়ে শিক্ষার প্রতি হয়তো আগ্রহী হয়ে ওঠে না, আবার অনেকের সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে অনেক মা-বাবা একটি পর্যায়ে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়ার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এছাড়া দেখা যায় বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েদের আগ্রহ কম অথবা এক্ষেত্রে সুযোগের অভাব রয়েছে। নারী সমাজকে আরো এগিয়ে যেতে হলে তাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষায়ও এগিয়ে আসতে হবে। এখনও কেউ কেউ মনে করেন, এতো পড়াশোনা করে কি হবে, আবার গৃহস্থালি কাজেইতো নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। অনেকেই এমএ পাশ করেও চাকুরি বা স্বনিয়োজিত অর্থকরী কাজকর্ম করেন না, হয়তো সুযোগ থাকে না অথবা নিজে করতে চান না। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু তারপরও দেখা যায় কোনো পড়াশোনা না করে মেয়েরা যে গৃহস্থালি কাজ করছেন, এমএ পাশ করেও অনেকে সেই একই কাজ করছেন। গৃহস্থালি কাজ কারো না কারো করতে হবে, তবে তা শুধু কারো (মেয়েদের) জন্য নির্দিষ্ট থাকবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের সবার মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। যারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, তাদের শিক্ষা যাতে তারা কাজে লাগাতে পারেন সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে।

আমাদের আরো একটি অর্জন হচ্ছে, আমরা শিশু-মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে পেরেছি। প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হারও দ্রুত কমছে। রপ্তানী অনেকগুণ বেড়েছে, এক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও (২০০৮ সাল থেকে যে বিশ্বমন্দা শুরু হয়েছে) বাংলাদেশ বিগত তিন বছর যাবত ছয়-সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পেরেছে, যা পৃথিবীর অনেক দেশ পারেনি। চীন, ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ অন্যত্র কয়েকটি দেশ বাদ দিলে অন্য সব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিগত দেড় দশক বা তারও বেশি সময় ধরে বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হার বেশি। সুতরাং আমাদের নিজেদের অর্জনের কথা মনে রাখতে হবে।

অনেকের মনে হতাশা। তাঁরা মনে করেন, এদেশে কিছুই হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং আশাবাদী হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। এটাও অনস্বীকার্য যে, আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সত্ত্বেও আমাদের যথেষ্ট অর্জন রয়েছে এবং সেই অর্জনের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে হবে। এটাও সত্যি যে, আমাদের অনেক বাধা ছিল এবং এখনও রয়েছে। যেমন, দীর্ঘ সময় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। এরপর ২০ বছরের অধিক সময় ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল থাকলেও তা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, আজও হচ্ছে। তারপরও আমাদের দেশে দারিদ্র্যের অনুপাত কমেছে; ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে তা ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৭০-এর দশকে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সদ্য স্বাধীন অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ বা তারও বেশি মানুষ দরিদ্র ছিলেন। বর্তমানে দারিদ্র্যের অনুপাত

অনেক কমে আসলেও দুর্ভাগ্যবশত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা তেমন কমেনি। কারণ ইতোমধ্যে দেশে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। স্বাধীনতার পরপর যেখানে সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় কোটি মানুষ দরিদ্র ছিল, সেখানে এখনও পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ দরিদ্র। দারিদ্র্যের এই পরিমাপ করা হচ্ছে শুধুমাত্র ৫টি মৌলিক চাহিদার (খাদ্য, বাসস্থান, কাপড়, চিকিৎসা ও শিক্ষা) ন্যূনতম প্রাপ্যতার ভিত্তিতে।

কিন্তু আমরা যদি দারিদ্র্যকে ব্যাপক ভিত্তিতে বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে অনেক বেশি মানুষ দরিদ্র। দারিদ্র্য শুধু অর্থের ব্যাপার নয়, শুধু মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম পূরণও নয়। দারিদ্র্যকে দেখতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, মননশীলতার বিকাশ, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্প্রসারণের বিবেচনায়। অর্থাৎ নিজের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ, সামাজিক পুঁজির বিকাশ, ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি প্রভৃতি দিক বিবেচনায় নিতে হবে। মূল লক্ষ্য হবে প্রত্যেক ব্যক্তির মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ। আর এই আঙ্গিকে নিঃসন্দেহে এদেশে অনেক অনেক বেশি মানুষ দরিদ্র। সকলের জন্য মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, এই লক্ষ্য স্থির করে সমাজ বিবর্তনধারা রচনা করার প্রচেষ্টা দেশে একটি সুস্থ সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে আমি মনে করি।

এরপর কিছু কথা বলতে চাই মানব-অগ্রগতির জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃজন বিষয়ে। অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, মানুষের স্বাধীনতার সম্প্রসারণই হচ্ছে উন্নয়ন। এই স্বাধীনতার মানে নিজের ইচ্ছানুসারে নিজেকে গড়ে তোলার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার মানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সকল ধরনের বঞ্চনা থেকে মুক্ত জীবন যাপন করা; এবং সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশের পক্ষে যত অনুকূল হবে, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়ন গতিশীল হবে। সেরকম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অবশ্য সকলের জন্য মানব-মর্যাদার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। অনেকের খাদ্যের নিরাপত্তা নেই। তাদের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশুদ্ধ পানির নিরাপত্তাহীনতা একটা বড় সমস্যা, সেদিকে নজর দিতে হবে। জ্বালানির নিরাপত্তাহীনতা তো রয়েছেই। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষের বিদ্যুতের সঙ্গে পরিচিতিই নেই। যাদের বিদ্যুৎ সংযোগ আছে তারাও পর্যাপ্ত পরিমাণে তা সবসময় পান না। তাছাড়া দেশের মানুষ অন্যান্য নানা ধরনের নিরাপত্তাহীনতায়ও ভোগেন, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং বাসস্থানের নিরাপত্তাহীনতাও প্রকট আকার ধারণ করছে। যাঁরা বাস্তুহারা হয়ে যান তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতা। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বাংলাদেশে খুবই দুর্বল। কমিউনিটি হাসপাতালগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। কাজেই এসকল নিরাপত্তাহীনতা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই নিরাপত্তাহীনতাগুলো দূর করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি উপর্যুক্ত অন্যান্য করণীয়গুলোর দিকে কার্যকরভাবে নজর দিতে হবে। এটা বোধগম্য যে, সরকার একা এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবে না। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, যার যে দায়িত্ব তা আমাদেরকে সঠিকভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ পুরো সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথ পরিক্রমায় সকলকে অংশীদার হতে হবে।

অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। শুধু ঋণ বা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়, তবুও গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থপ্রবাহ বাড়াতে হবে। বাস্তব অবস্থা ও কর্মসূচি বিবেচনায় যার যার চাহিদা মতো ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে অর্থাৎ যার ৫ হাজার টাকা দরকার তিনি ৫ হাজার টাকা, যার ৫০ হাজার টাকার দরকার তিনি ৫০ হাজার টাকা, যার ১০ লাখ টাকার দরকার তিনি ১০ লাখ টাকার ঋণ পাবেন, এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থপ্রবাহ যদি না থাকে, তাহলে মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা বা তাদের যে পরিকল্পনা আছে, তার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কিন্তু শুধু অর্থ দ্বারা টেকসই অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ, যথাযথ প্রযুক্তি প্রাপ্তির সুযোগ ও বিপণন সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উৎপাদনশীলতা। যদি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সুযোগ না থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কাজের টেকসই সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কাজেই যে যে ক্ষেত্রে উৎপাদশীলতা বাড়ানো সম্ভব, সেগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় এনে সেসব খাতে ঋণ এবং উল্লিখিত অন্যান্য সেবা সরবরাহ বাড়াতে হবে। অর্থাৎ শুধু ঋণ দিলে হবে না, সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমরা অনেকদিন থেকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার কথা বলে আসছি। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে এ নিয়ে অনেক দিক-নির্দেশনামূলক গবেষণাও হয়েছে, কিন্তু অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। অর্থাৎ বিষয়গুলো আমরা জানি, কি করতে হবে তা-ও জানি। আমাদের করণীয় হচ্ছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করে ফলাফল দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানসম্পন্ন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের ন্যায্য মূল্যে বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিপণন দেশের ভিতরেও হতে পারে, দেশের বাইরেও হতে পারে। তবে দেশের ভেতর ও বাইরে বর্তমানের বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাই বাজার পেতে হলে, ধরে রাখতে হলে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যসামগ্রীর মান ধরে রাখতে হবে। আমরা লক্ষ করছি যে, বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে শুরুর দিকে পণ্যের মান খুব ভাল থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে দ্রুত মুনাফা অর্জনের মানসিকতার কারণে উৎপাদিত পণ্যের মানের দিকে আর নজর দেয়া হয় না। ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও বাজারজাতকরণে সমস্যা দেখা দেয়।

এখন আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় যাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তিকরণ সে সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। কাউকে কোনো কর্মসূচি থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেয়া যাবে না। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমেও সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সবচেয়ে দরিদ্র ১০-১৫% মানুষকে সাধারণত ক্ষুদ্রঋণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

অথচ যাঁরা অতিদরিদ্র, যাঁরা পিছিয়ে আছেন, তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন। আর সমাজের ঐ অংশকে পেছনে ফেলে রেখে দেশের টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কার্যকর অন্তর্ভুক্তি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বৈষম্য। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেলেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে, সেটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া সাম্য শুধু একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়, আর্থিক এবং মানব মর্যাদার ভিত্তিতে দারিদ্র্যের মূল কারণ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে তা টেকসইভাবে কমিয়ে আনতে হবে। আর এই কাজটি করতে হবে বিভিন্ন আঙ্গিক বিবেচনায় রেখে। বাংলাদেশে গড়ে বছরে যে ৫.৪ শতাংশের মত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বিগত দেড় যুগ বা তারও বেশি সময় ধরে, তার সামান্য অংশই দরিদ্র মানুষ ভোগ করতে পেরেছেন। যারা ধনী এবং যাদের অনেক সম্পদ রয়েছে অর্থাৎ যারা সমাজে ক্ষমতাবান তারাই এই কর্মসাফল্যের প্রবৃদ্ধির সুফল পেয়েছে। সুতরাং আমাদের সমাজকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন হবে। বর্তমানকালের নব্য উদারতাবাদভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা ১৯৭০-এর দশক থেকে জোরালোভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে, আমাদের অর্থনীতির মূল সুরও সেটি। এই প্রক্রিয়ায় যাঁদের হাতে অর্থ-বিত্ত প্রযুক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে তাঁরাই প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী থাকেন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল ভোগ করেন, অন্যরা শ্রম দিয়ে ঐ সফলতায় অবদান রাখেন, কিন্তু তাঁরা অগ্রগতির ন্যায্য অংশ পান না। এই অসম প্রতিযোগিতায় দুর্বলরা পিছিয়ে পড়েন, পিছিয়ে থাকেন। এমন বৈষম্যপূর্ণ একটা সমাজব্যবস্থা চলতে পারে না বা চলতে দেয়া যায় না। এই বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস জরুরি। অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, স্বল্প আয়ের মানুষ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বর্তমান বাজেট ও বিগত তিন বছরের বাজেট বিন্যাস ও বরাদ্দ নির্ধারণে এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেখা যায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি এবং গ্রামীণ অকৃষি খাতের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। এসব খাতে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। নব্য উদারতাবাদভিত্তিক প্রক্রিয়া থেকে হয়তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারবো না, কিন্তু আমাদের অর্থনীতিকে টেকসই করে গড়ে তুলতে হলে, অর্থনৈতিক নীতি-কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার জনকেন্দ্রিক পুনর্বিন্যাসের পথে আমাদেরকে অবশ্যই হাঁটতে হবে।

এখন আমি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করবো। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এখনও এমন যে, এখানে সাধারণত পুরুষ বাইরে কাজ করবে, নারী ঘর সামলাবে এটাই যেন চিরস্থায়ী নিয়ম। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, সুষ্ঠু এবং সুষম পারিবারিক উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে একসঙ্গে ঘরে এবং বাইরে কাজ করতে হবে এবং সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে। এছাড়া যৌতুক সম্পর্কিত বাস্তবতা আপনারা জানেন। আইন থাকা সত্ত্বেও এই জঘন্য অপরাধ রোধ করা যাচ্ছে না। সেটা বন্ধের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আবার অনেকক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একই কাজ করেন, কিন্তু নারীরা কম বেতন পান। এ অবস্থা শুধু আমাদের দেশেই বিরাজ করছে তা নয়, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অনেক ক্ষেত্রে নারীরা একই কাজ করে কম বেতন পান। এটা গ্রহণযোগ্য কোনো সামাজিক ব্যবস্থা নয়। আমরা চাই এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা হবে যা পূর্ণত অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন এবং শোষণহীন। আমরা যদি একটি উদার জনকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি যেখানে সকলের জন্য সর্বক্ষেত্রে সম-সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে (যে বিষয়ে আমাদের সাংবিধানিক নির্দেশনা রয়েছে), তবেই তা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাজ ব্যবস্থা হয়ে উঠবে। কাজেই আমাদের সবাইকে সচেতনভাবে সেই সমাজ বিনির্মাণের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে বলে আপনারা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সুযোগ সৃষ্টি করলেই যে সবাই সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন তা নয়। সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সুযোগ গ্রহণ করার মতো অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে। যেমন, বিদ্যালয় আছে কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে অনেকে বিদ্যালয়ে পড়তে পারছে না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেকের তা গ্রহণ করতে না পারার প্রতিবন্ধকতা কোথায় তা খুঁজে বের করতে হবে এবং কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার মাধ্যমে সকলেই যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

আমি দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে অনেক সময় শক্তিশালী শব্দটির ব্যবহারে ত্রুটি থাকে বলে আমি মনে করি। শক্তিশালী করার কথা বললে এটিও বোঝা যেতে পারে যে, যেটা বিদ্যমান সেটাকেই শক্তিশালী করতে হবে। তবে প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকার তখনই শক্তিশালী হবে, যখন এটিকে সাংবিধানিক তাগিদ অনুসারে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বর্তমানের তুলনায় উন্নত ও জনবান্ধব করা হবে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়সহ সমাজের সকল পর্যায়ে এমন একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করতে হবে, যা হবে মানুষকেন্দ্রিক। স্থানীয় সরকার হবে স্থানীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এছাড়া স্থানীয় সরকারের আর্থিক সক্ষমতা ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও জরুরি। উন্নত বিশ্বে আইন অনুযায়ী হস্তান্তরিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তা পালন করার জন্য এর আর্থিক সংস্থান ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা থাকে।

আপনারা অনেকেই জানেন যে, শিক্ষানীতি-২০১০ গৃহীত হয়েছে। এটা অত্যন্ত জনমুখী একটি শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি রাজনৈতিক দল ও মত নির্বিশেষে দেশে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। কওমী মাদ্রাসাসহ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এতে বক্তব্য রয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং এটি সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতি, যার অন্যতম মূলকথা হচ্ছে 'অন্তর্ভুক্তি' অর্থাৎ কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। দরিদ্র হোক, পাহাড়ি হোক, শহুরে হোক, গ্রামে বসবাসকারী হোক, নদীভাঙ্গন এলাকার হোক, হাওরবাসী হোক, পিছিয়ে পড়া সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। শুধু আনলেই হবে না, তারা যেন ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, কাউকে যেন বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে

রাস্তায় বা মাঠে-ঘাটে কর্মরত অবস্থায় দেখা না যায়। সেজন্য এই শিক্ষানীতিতে অনেকগুলো করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা আইন প্রণয়ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আমার জানা মতে, শিক্ষা আইনেও পিছিয়ে পড়া জনগণ এবং অঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ রয়েছে এই শিক্ষানীতিতে এবং শিক্ষা আইনও তা ধারণ করবে বলে জানা গেছে। এই শিক্ষানীতিতে গ্রাম এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার তাগিদ রয়েছে এবং তা শিক্ষা আইনেও থাকবে বলে আমার ধারণা। তাই শিক্ষানীতি-২০১০ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আমরা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারব এবং পাশাপাশি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে সক্ষম হবো। এটা করা না গেলে জাতীয় উন্নয়নের যে গন্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সে গন্তব্য আরও দূরে সরে যেতে থাকবে। অতীতে যেভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হয়েছে তাতে অনেকক্ষেত্রেই আমাদের দুর্বলতা প্রকট ছিল এবং এখনও রয়েছে। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং সর্বোচ্চ মান অর্জন ও বজায় রাখার দিকে আমাদের সকলের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে। মানুষের কর্মতৎপরতা বাড়ানো ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে সহায়তা দানের জন্য সামাজিক পুঁজি গঠন করতে হবে। অর্থাৎ জনগণকে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টা-কাঠামোয় কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রচেষ্টা চলছে, এগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। একা একা যে কাজ করা কঠিন বা সম্ভব নয়, লোক-মোর্চা গঠন করে সে কাজ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং কোথাও এই প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকলে তা অব্যাহত রাখতে হবে, জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরনের কাজের অনেক উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং, যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক পুঁজি গঠন করার চেষ্টা করছেন, আমরা তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা করি এ ধরনের কার্যক্রম সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলো আসলে এক সুতোয় গাঁথা। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম জরুরি এবং সেই আঙ্গিকে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। নীতিগতভাবে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের এই ধারণা গৃহীত। তবে বাস্তবে এর প্রতিফলন এখনও সীমিত। সচেতনভাবে আমাদেরকে টেকসই উন্নয়ন-ধারায় অবদান রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্যে নীতিকাঠামো তৈরি এবং সমাজের সকল স্তরে এর প্রয়োগ এবং যথাযথ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে।

এখন হরহামেশা সবাই জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলছেন, কিন্তু এর ফলে কি কি সমস্যা হচ্ছে এবং কি কি সমস্যা হতে পারে, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক তা সঠিকভাবে অনুসন্ধান এবং অনুধাবন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলোকে পূর্বেই অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং আগাম সতর্কীকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের বিভিন্ন ঝুঁকি কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করা জরুরি। লক্ষ করা যাচ্ছে যে,

বর্তমানে বাংলাদেশে বন্যা ঘন ঘন ও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যখন যতটা বৃষ্টি সাধারণত হওয়ার কথা, ততোটা হচ্ছে না, আবার বৃষ্টি শুরু হলে সেটা থামছে না অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর চলে আসছে, নদীভাঙন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনেক মানুষ বাস্তুহারা হচ্ছেন। আরো নানারকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বস্তুত, ভৌগোলিক অবস্থান ও ঘনবসতিপূর্ণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট বিবেচনায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে এক হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করে। মূলত কয়েকটি ক্ষুদ্র শহর-রাষ্ট্র বাদ দিলে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এ অবস্থায় যদি একটা প্রবল ঝড় হয় তবে যত মানুষ এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একই ধরনের ঝড়ের কারণে পৃথিবীর আর কোথাও এত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য সক্ষমতায় আমাদের ঘাটতি রয়েছে, অর্থাৎ পর্যাপ্ত অর্থ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও লোকবলের ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নশীল, বিশেষ করে অধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন দেশগুলোর অনুকূলে উন্নত বিশ্ব থেকে অর্থ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উন্নত বিশ্বে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ দ্রুত কমিয়ে আনা সংক্রান্ত আলোচনা চলছে। বাংলাদেশ তাতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করছে।

সচেতনভাবে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাত মোকাবেলায় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) গ্রহণ করেছে। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ড (BCCRF) গঠন করেছে। BCCTF-এর অর্থায়নে ইতোমধ্যে ৮৩টি প্রকল্প সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। BCCRF থেকে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমেও প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করা এবং ঝুঁকিগুলো কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য কর্মকাণ্ড ও বাস্তবায়নাধীন কিছু কিছু প্রকল্প রয়েছে। যদিও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় বিশ্ববাসীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার লক্ষ্যে স্বল্প-গ্রীন হাউজ-নিঃসরণভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে যেন তা বিরূপ প্রভাব না ফেলে তা দেখতে হবে এবং আমাদেরকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে প্রযুক্তি ও অর্থ প্রদান করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আমরা মোটেই দায়ী নই, কিন্তু এর ফলে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী দেশসমূহের প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

কিন্তু সরকারের একার পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যাপক কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এটি আমাদের সম্মিলিতভাবে করতে হবে। পিকেএসএফ শিগগিরই এ ব্যাপারে BCCRF থেকে প্রাপ্ত তহবিল দ্বারা কিছু কর্মকাণ্ড শুরু করছে। BCCRF-এর যে ১০ শতাংশ এনজিওদের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নির্ধারিত, তা পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে

বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা নয় এমন উভয় ধরনের এনজিওদের এ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পিকেএসএফ বিবেচনা করবে এবং গ্রহণযোগ্য হলে অর্থায়ন করা হবে।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে, তাদের জনসংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু দেশের অগ্রগতিতে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। সেজন্য ২০১০ শিক্ষানীতিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জন্য নিজেদের ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্য বাংলা, যা জাতীয় ঐক্য গঠনে সহায়ক হবে। ভাষা, ধর্ম, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে সবাই তাদের জাতিসত্তাভিত্তিক নিজস্বতা বজায় রেখে একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠনে কাজ করবেন - সেটাই কাম্য। ইংরেজিতে বলা যায়, "Unity in Diversity" অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য থাকবে, কিন্তু সবাই জাতির অগ্রগতি সাধনে একটি ঐক্যবদ্ধ ও বৃহত্তর কাঠামোয় অংশগ্রহণ করবেন।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ পিকেএসএফ-এর মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস-এ এই সংস্থার মূল দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ একটি হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু শুধু ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়, তা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। তাই, ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে শুরু করা হলেও, পিকেএসএফ এর কার্যপরিধি বিস্তৃত করতে শুরু করে এবং সম্প্রতি 'সমৃদ্ধি' নামক একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় চালু করেছে। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম পিকেএসএফ-অর্থায়িত সকল কর্মকাণ্ডের অবধারিত অনুষঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর কর্ম-পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রমসমূহ পরিমার্জন করছে, নতুন আঙ্গিক যুক্ত করছে এবং নতুন কর্মসূচিও গ্রহণ করছে।

একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা জাকির হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলে গেছেন, তিনি কিভাবে কর্মচারী থেকে উদ্যোক্তা হয়েছেন। আমরা উত্তরোত্তর সবার অগ্রগতি দেখতে চাই। আমরা চাই অধিক সংখ্যায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি হোক। উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য পিকেএসএফ-এর নীতিমালা অনুসারে একজন উদ্যোক্তাকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত পুঁজি সরবরাহ করা যায়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আগে উদ্যোক্তা প্রথমে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কয়েক বছর তা ব্যবহারের পর ভাল করলে তবেই কিছুটা বেশি ঋণ পাওয়া যেত, সেজন্য দীর্ঘদিন পরও উদ্যোক্তা পর্যায়ে খুব কম ব্যক্তিই আসতে পেরেছেন। এখন আর সেই অবস্থা নেই। বর্তমানে যদি কেউ গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, তাহলে সরাসরি উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা পেতে পারেন। এই পরিবর্তনটা অবশ্যই বিশাল। যার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা রয়েছে, তিনি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহযোগিতা পাবেন, এগিয়ে যেতে পারবেন। একজনকে যদি ১০ লাখ টাকার ঋণ সরবরাহ করা হয়, তিনি তখন মজুরির ভিত্তিতে কয়েকজনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবেন। প্রয়োজনে গুচ্ছভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য সেবা সরবরাহের মাধ্যমে এরকম উদ্যোগ সম্প্রসারণে ও এগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা

দেয়া হবে। অর্থাৎ যখন একই ধরনের দ্রব্যাদি উৎপাদনে অনেক উদ্যোক্তা পাশাপাশি বা কাছাকাছি তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, সেখানে প্রশিক্ষণ ও তথ্যসরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে এবং এই কেন্দ্র থেকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আপনারা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, **সমৃদ্ধি** পরিবারভিত্তিক একটি সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম। এর পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর প্রচলিত আর্থিক সেবাকার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমেও সম্প্রতি জন-কেন্দ্রিক লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। সমৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দারিদ্র্য দূরীকরণে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা দান। প্রথম ধাপে এ কর্মসূচি ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১টি ইউনিয়নে দু'বছর পূর্বে শুরু করা হয়েছে। শুরুতেই এই ইউনিয়নগুলোর প্রত্যেকটি খানার আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবং নির্ধারিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১১৭,৬১৬টি খানার মধ্যে ৮৫,৫২৩টি খানা (শতকরা ৭৩ শতাংশ) এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। মে ২০১২ পর্যন্ত ২১টি ইউনিয়নের ৫৩,৫৮৭টি খানা (৬২.৬৬%) সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি আরো ১৪টি ইউনিয়ন **সমৃদ্ধি-র** আওতায় যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ এবং সামাজিক পুঁজি গঠনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির সংমিশ্রণে একটি সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা আশা করি, প্রত্যেকটি বাড়ি সমৃদ্ধ বাড়ি হবে। সমৃদ্ধ বাড়ির মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠিত হবে, ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হবে, সবার স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হবে, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, পরিবারের সকলের ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্প্রসারিত হবে, তাদের মানবাধিকারসমূহ নিশ্চিত হবে। সমৃদ্ধ গ্রামে সামাজিকভাবে একসঙ্গে কাজ করার এবং সকলের সহযোগী ও সহমর্মী বসবাসের পরিবেশ নিশ্চিত হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমরা একে অপরকে সহ্য করতে পারি না। এতে সংঘাত দেখা দেয়, নিজের ও সমাজের উন্নয়নে সংকট সৃষ্টি হয়। কারণ সমাজে সবার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে নিজের ও সমাজের প্রয়োজনে ও স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

সমৃদ্ধি-র আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হবে শুধু সেই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যেগুলোতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়, সবক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। উৎপাদনশীলতা বাড়লে মুনাফা ও সঞ্চয় বাড়বে, নিজের সঞ্চয় ব্যবহার করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে, জাতীয় প্রবৃদ্ধিতেও এর অবদান বাড়বে। কাজেই সেই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবসা হিসেবে শিল্প চিহ্নিত করতে হবে।

আরেকটি বিষয় হল, মানুষের সঙ্গে কাজ করার আর মানুষের জন্য কাজ করা ভিন্ন ব্যাপার। কারো জন্য কাজ করা মানে হতে পারে একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা। আর মানুষের সঙ্গে কাজ করা মানে হচ্ছে, সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন, কেউ হয়ত অর্থায়ন করছেন, অন্যজন সেই অর্থ ব্যবহার করে নিজের অবস্থার উন্নতি করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। এখানে দাতা-গ্রহীতার বিষয়টি অনুপস্থিত। সমৃদ্ধির লক্ষ্য ও কর্মকৌশল

হচ্ছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকে নিজে সমৃদ্ধ হবেন, একটি পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বাড়বে, সবাই এগিয়ে যাবেন এবং এখানে প্রত্যেকের প্রয়োজন ও করণীয় নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ সবসময় সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকলের পাশে থাকবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজে মানব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। এটি হচ্ছে **সমৃদ্ধি-র** চেতনা। **সমৃদ্ধি** আরো সমৃদ্ধ হবে যদি এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মানুষ সমৃদ্ধ হোন। **সমৃদ্ধি-র** আওতায় চুয়াডাঙ্গার সীমান্ত ইউনিয়নে 'লোক উন্নয়ন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সবাই একসাথে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করছেন, এটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে বলে আমি মনে করি। এই কেন্দ্রে টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা এবং বই-পত্র থাকবে। ফলে সকলের শিক্ষার সুযোগ এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাবে। এখানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে, সালিশ-এর ব্যবস্থাও থাকতে পারে। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন সমৃদ্ধ হবে, পরিবারগুলো সমৃদ্ধ হবে সেই লক্ষ্যে 'লোক উন্নয়ন কেন্দ্র' সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি খুবই আশাবাদী।

সমৃদ্ধি-র আরো একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, একটা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে, কেন **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে? আমি মনে করি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিচ্ছন্নভাবে দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত না হলেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। আমরা কোনো একটি কার্যক্রম শুরু করতে পারি এবং কিছু দূর হয়তো এগিয়ে নিয়েও যেতে পারি, কিন্তু তা টেকসই করতে হলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র সমন্বিত উন্নয়ন ভাবনা ও কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিতে হবে। সে কারণে **সমৃদ্ধি-তে** ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে চার ধরনের অংশীদার রয়েছে-অংশগ্রহণকারী পরিবার, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, পিকেএসএফ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। সবার দায়িত্ব আলাদা এবং সবাই যাঁর যাঁর দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ কেউ বলেছিলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না - এর ফলে ঝামেলা বাড়বে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। ২১টি ইউনিয়নে কাজ চলছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ আগ্রহসহকারে সহায়তা দিচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক কেননা তাদের ইউনিয়নেইতো উন্নয়নের কাজ হচ্ছে।

আরেকটি বিষয়, অতিদরিদ্রদেরকে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা গেছে। তাদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হল, একটি অতিদরিদ্র পরিবার নিজের ব্যাংক হিসেবে দু'বছরে যত টাকা সঞ্চয় করবে (অনুর্দ্ধ ২০,০০০ টাকা) ঐ পরিমাণ টাকা পিকেএসএফ থেকে তাদেরকে অনুদান দেয়া হবে, তবে শর্ত হচ্ছে, সঞ্চয় ও অনুদানের অর্থ দিয়ে একটি সম্পদের মালিকানা গড়তে হবে। অর্থাৎ জমি ক্রয় করা, উৎপাদনে ব্যবহার করার জন্য কোনো মেশিন ক্রয় বা পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সে অর্থ ব্যয় করতে হবে। ফলে অতিদরিদ্র যে পরিবার এই কর্মসূচিতে যোগদান করেছে, দু'বছর পর তার একটা অর্থনৈতিক ভিত তৈরি হবে, তা যত ছোটই হোক। ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ

হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলেও পরিবারটি ঐ সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর ক্ষুদ্রঋণ তো একজনের জন্য যুগ যুগ ধরে কাম্য হতে পারে না। টেকসই অর্থনৈতিক অবস্থায় উত্তরণই সবার কাম্য। আর সেই লক্ষ্যে পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধি জরুরি। আশা করছি, **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি আরো এগিয়ে যাবে এবং কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনতে পারবে।

আমি আরো দু'টো বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে, পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিল গঠন। বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত বা কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা অসহায় কাউকে সহায়তা দেয়ার মতো ব্যবস্থা পূর্বে পিকেএসএফ-এর ছিল না। এরূপ বাস্তবতায় পিকেএসএফ-এ পাঁচ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এর আয় থেকে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্তদেরকে কিছু সহায়তা দেয়া শুরু করা হয়েছে। সত্যিকারের কোনো দরিদ্র, নিঃস্ব ও অসহায় পরিবার বা ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী হলে পিকেএসএফ উল্লিখিত তহবিলের আয় থেকে সহায়তা দিতে পারে। এই তহবিলের পরিমাণ যাতে প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি এর আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেকগুলো অতিদরিদ্র পরিবারের ১৮৬ জন ছেলেমেয়েকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যাদেরকে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেছে। এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, ৬৬ জন। আমরা আশা করছি, পরবর্তীকালে মেয়েদের সংখ্যা অর্ধেক অথবা তারও বেশি হবে।

দ্বিতীয়টি হলো, পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি সহায়ক তহবিল। একটি উদাহরণ দিয়ে এই তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয় কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা বোঝানো যায়। আমাদের কোনো কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত কোনো সদস্যের বাড়ি যদি ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যায়, সেক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সাধারণত ঋণ মাফ করে দিতে পারবে না এবং অনুদান দিয়ে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও ঐ সংস্থার পক্ষে সব সময় সম্ভব নয়। কারণ, সহযোগী সংস্থাদের বেশির ভাগ অর্থই তারা ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে যা সার্ভিস চার্জসহ ফেরত দিতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের নিকট থেকে কিস্তি আদায় বড়জোর কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পিকেএসএফ কর্মসূচি সহায়ক তহবিল গঠন করেছে। এটা ৫০০ কোটি টাকার একটি তহবিল। ইতোমধ্যে এ তহবিলের জন্য ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর থেকে পিকেএসএফ-অর্থায়নকৃত কোনো কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিবার প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে অর্থনৈতিকভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে অবস্থা বিবেচনায় অনুদান বা সার্ভিস চার্জ ছাড়া ঋণ বা স্বল্প সার্ভিস চার্জসহ ঋণ দিয়ে সহায়তা দেয়া যাবে।

আরেকটি বিষয় নিয়ে বর্তমানে অনেকেই আলোচনা করেছেন, সেটি হচ্ছে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহ অনেক সুন্দর এবং মানসম্পন্ন পণ্য প্রস্তুত করেন, তবে এগুলোর বিপণনের তেমন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য পিকেএসএফ ঢাকায় একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে। এই কেন্দ্রে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন এবং বিক্রি করা যাবে।

এ ধরনের নতুন পদক্ষেপগুলোতে জনগণের প্রয়োজনের বিষয়টি যদি সঠিকভাবে প্রতিফলন করানো যায়, তবে সেগুলো অবশ্যই কার্যকর হবে।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এই বলে যে, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এদেশকে একটা সুন্দর দেশ হিসাবে গড়ে তোলা, এদেশে একটি মানব-মর্যাদাসম্পন্ন সমাজ তৈরি করা এবং এদেশের প্রত্যেক নাগরিকের মানব-মার্যদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। সচেতনভাবে আমরা যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাই, তাহলে সেই লক্ষ্যের দিকে আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারবো। এই লক্ষ্য নিকট ভবিষ্যতে অর্জিত হয়ে যাবে, সেটি আমরা আশা করি না, তা বাস্তবসম্মত নয়। তবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

দীর্ঘ এই বক্তৃতা ধৈর্য্য ধরে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
টেলিফোন ঃ ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল ঃ pksf@pksf-bd.org, ওয়েব সাইটঃ pksf-bd.org